গণিতপরিক্রমা ২৭শ খণ্ড ২০১৭ পৃ. ৩৩-৪৪

আজিজুর রহমান খলিফা ও রাজশাহীতে মহরমের দাঙ্গা

মুনিবুর রহমান চৌধুরী

গণিত পরিক্রমার ১২শ খণ্ড (২০০২), পৃ. ২৯-৪৯ যে প্রবন্ধটি ছাপানো হয়েছিল, তাই এখানে বর্তমান শিরোনামে পুনর্মুদ্রিত হল। সম্প্রতি আমরা খলিফা স্যারের পুত্র ইঞ্জিনিয়ার ফজলুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে স্যারের মৃত্যুর তারিখ উদ্ধার করেছি। তারিখটি হচ্ছে ৪ জুলাই ১৯৮৪। খলিফা স্যার ১৯০৪ সালে কুষ্টিয়া (তদানীন্তন নদীয়া) জেলার ভেড়ামারায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন[১]। বহু প্রতিকূল অবস্থার সাথে সংগ্রাম করে তিনি গণিতশাস্ত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৫ সালে বি.এ. অনার্স (তখনকার দিনে দুই বছর মেয়াদী) এবং ১৯২৭ সালে এম.এ. (উভয়) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর মাঝখানেই তিনি ১৯২৬ সালে বি.সি.এস. (বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং যথারীতি প্রথম স্থান অধিকার করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে সরকারি চাকুরী শুরু করেন। ১৯৪২ সালে তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন[২] এবং দেশের বাড়ীতে ভেড়ামারা হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন[৩]। দেশ বিভাগের (অর্থাৎ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের) পর খলিফা স্যার ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন।

পঞ্চাশের দশকে খলিফা স্যার লালমাটিয়ায়, মিরপুর রোডের সন্নিকটে, এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন এবং কালক্রমে তথায় টিনের ঘর (খলিফা কুটির) নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি 'খলিফা প্রেস' নামে একটি ক্ষুদ্র ছাপাখানাও স্থাপন করেন। প্রেস হতে অর্থাগম কি হয়েছিল, বলা মুশকিল, কিন্তু নিজস্ব প্রেসের সুবাদে তিনি নিজের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ কাজে লাগিয়ে 'গণিত কাঁদিয়া ফেরে' নামে যে (অসমাপ্ত ও অপ্রকাশিত) পুস্তক বিক্ষিপ্তভাবে রচনা করেছিলেন এবং অনেক দূর ছাপিয়ে ছিলেন, তাতে অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে। গণিত বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক, বাংলাদেশ গণিত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ড. শেখ সোহরাবুদ্দীনের সৌজন্যে আমরা এই বিচিত্র গ্রন্থের মুদ্রিত পৃষ্ঠা ১ হতে ১৫২ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পেরেছি। গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে খলিফা স্যারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। গণিতের প্রতি অবিচল অনুরাগ ও মর্মস্পর্শী মমত্ব তাঁর চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উলে- খযোগ্য দিক। গণিতের নব নব সমস্যা উদ্ভাবন এবং সমস্যার সুন্দর, সংক্ষিপ্ত, বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান তাঁকে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করত। গণিতে যেকোনো ধরনের অস্পষ্টতা, স্থূলতা, মূঢ়তা, খামখেয়ালিপনা, অমনোযোগ ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ ছিল তাঁর চক্ষুশূল। এরূপ সকল

নিদর্শনের প্রতি তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। এর পরিচয় 'গণিত কাঁদিয়া ফেরে'র সিংহভাগ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাথমিক স্তর হতে স্নাতক পর্যায়ের তৎকালীন (পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের) এতদদেশীয় পাঠ্যপুস্তকের নানান্ অসঙ্গতি, গণিতে প্রশ্নের নিকৃষ্ট বা কষ্টকল্পিত সমাধান, তত্ত্বগত বা মৌলিক ভুল-ত্রুটির ভুরি ভুরি উদাহরণ দিয়ে ঐসব ভুল-ত্রুটি শুধরিয়ে সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত সমাধানের পথও খলিফা স্যার এই পুস্তকে দেখিয়েছেন। তাই তাঁর সমালোচনা বিদ্বেষপ্রসূত নয়, বরং গঠনমূলক।

নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে খলিফা স্যার এমন কিছু কথা বলেছেন যা বর্তমান প্রবন্ধের জন্য প্রাসঙ্গিক।

'নদীয়া জেলার দৌলতপুর থানার রিফাইতপুরের আচার্য্য বাবুদের জমিদারী এলাকায় মুসলমানী সভ্যতা-সংস্কৃতির নামগন্ধও ছিল না; মুসলমান ছেলেদের লেখাপড়া তারা সহ্য করতে পারত না। ঘটনাক্রমে সেখান থেকে শিকারপুর[৪] গিয়ে আমি কিছু লেখাপড়া শিখলাম বটে; কিন্তু ঐ হাই স্কুলে সমসাময়িক কোনও জাতীয় আন্দোলনের কোনরূপ প্রবেশ-অধিকার ছিল না। এক মৌলভী সাহেবই ছিলেন একমাত্র মুসলমান শিক্ষক। ঐ স্কুলে আমার পড়াশুনা নির্ভর করত একমাত্র হেডমাস্টার সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের উপর; এ ব্যাপারে তিনি আমাকে অযাচিতভাবে ও মুক্তহস্তে সাহায্য করতেন, যার জন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ (পৃষ্ঠা ৫৭)।"

"১৯২০-১৯২৫ সাল পর্যন্ত রাজশাহী কলেজে আমি আই.এসসি. ও বি.এসসি. পড়েছি, থাকতাম শরফউদ্দিন মহম্মদ সাহেবের বাসায়, জায়গীর; তিনি ছিলেন রাজশাহী সিভিল কোর্টের নাজির। সেকালের B. A.; ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তাঁর দুই ছেলে আলতাফ হোসেন (ওরফে আপতাব) এবং মোয়াজ্জেম হোসেন (ওরফে মাহাতাব) এই দুজনাকেই চড়াতে হত। জীবনে একটা ট্রাজেডি; অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার ৩/৪ দিন আগে খোঁজ, খোঁজ-খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, আমার সব কয়খানা নোট খাতা, দুই বৎসর ধরে লেখা, ওজনে ৪/৫ সের হবে, এরা বিক্রি করে চানাচুর খেয়েছে। একটু শাসন করলে বড় ভাইটি বলত, 'কত...মাস্টার দেখলাম'। সে এক ইতিহাস, ৪৪/৪৫ বৎসরের ব্যবধানে এখনও তা জাজ্বল্যমান মনে পড়ে (পৃষ্ঠা ৫১)।"

"এইসব ঐতিহ্য এবং পটভূমিকার মধ্যে আমার বাল্য ও কৈশোর কেটেছে, তাই কোনও আন্দোলনের মধ্যে মন না দিয়ে কাজে ব্যাপৃত থাকা আমার প্রকৃতিগত স্বভাব। অফিসে গাধার মতো খেটে যেতাম কোনও দিকে তাকাবার অবসর ছিল না (পৃষ্ঠা ৫৭)।" সরকারী চাকুরীর (তৎকালীন) পরিবেশ সম্পর্কে খলিফা স্যারের মূল্যায়ন: "চাকুরী জীবনে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হল উপরওয়ালাদের বাসাগুলিকে জানতে হবে আপনার তীর্থস্থান। কোন দেবতা কোন বিশেষ উপচারে কোন আসনে কোন মন্ত্রে খুশী থাকে, তা আপনাকে বুঝে গিয়ে তাঁরই মেজাজ মাফিক কাজ করতে হবে। কাজে-

অকাজে, কাজ না থাকলেও কাজের অছিলা করে তীর্থ-ভ্রমণ করবেন। তাঁরই মত, এক-আনা পরিমাণ কাজ না করে, জোরে-শোরে, সকলকে জানিয়ে চিৎকার করতে হবে পনের-আনার; বলে বেড়াতে হবে কাজের চোটে আপনি পথ দেখতে পান না, মধ্যে মধ্যে চোখে সর্ষের ফুলও দেখেন। কথায়-বার্তায় পঞ্চাশবার স্যার স্যার করবেন। দল জমলেই দলের মধ্যে বলবেন, হুজুরের মতো জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান, সদাশয় ব্যক্তি খুব বিরল; ভূ-ভারতে তাঁর মত সদ্বিবেচক লোক আছে কিনা সন্দেহ; দুঃখ করবেন এত কম বেতনে এত কাজ করেও তিনি যথাযথ কাজের পুরস্কার পান না; অন্য দেশ হলে এতদিনে তিনি কত উপরে উঠতেন। সাস্ত্রে চাটুবাক্য কয়ে খোদ ঈশ্বরের তুষ্টিবিধান করার ব্যবস্থা আছে; আর মানুষ-দেবতার তুষ্টি সাধনের জন্য এই সামান্য চাটুবাক্য কয়টিও আপনি ব্যয় করবেন না! তাহলে আপনি নিশ্চয়ই আহম্মক নম্বর এক; আপনাকে উপরে টেনে তোলা খোদাতালারও অসাধ্য। তবুও এমন দুই চারজন এমন হতভাগা লোক আছে যারা শিক্ষার দোষে, বা তাদের রক্তে কোন জিনিসের অভাববশত, যাঁকে তাকে যে-সে ভাবে তোয়াজ করতে রাজি নয়। তীর্থ-ভ্রমণের সময়টুকু তারা সময়ের অকারণ অপব্যয় মনে করে। অলস অকর্মণ্য ফাঁকিবাজ, কাজ-না জানা উপরওয়ালাকে তারা ঘৃণার চোখেই দেখে। তাদের অধীনে কাজ করাকে তারা দুর্ভাগ্য বলেই মেনে নেয়। কাজকেই তারা মনে করে কাজের পুরস্কার। আমি ছিলাম এই অকর্মার দলেরই একজন; মাথায় ছিট ছিল নিশ্চয়ই (পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪)।"

খলিফা স্যার ১৯৩৭ সালে যখন রাজশাহীতে এস.ডি.ও. (মহাকুমা প্রশাসক)-র সেকেন্ড অফিসার, তখন রাজশাহীতে মহরমের মিছিলকে কেন্দ্র করে সংগঠিত দাঙ্গার বিচারের ভার তাঁর উপর ন্যস্ড় হয়। বিচারে তিনি সকল সাক্ষ্য প্রমাণ পুঙ্খাপুঙ্খরূপে বিশে- ষণ করে সকল আসামী (বলাবাহুল্য, সবাই মুসলমান)-কে বেকসুর খালাস দেন। এই রায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনঃপুত না হওয়ায় তাঁর উপর নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসে।

এই শে- ষমাখা ভণিতা 'গণিত কাঁদিয়া ফেরে'র দীর্ঘতম এবং সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী অনুচ্ছেদ ছিন্নস্মৃতি: রাজশাহীতে সিনেমা হলে মহরমের দাঙ্গার উপক্রমণিকা মাত্র (পৃষ্ঠ ৫১-৬৪)। ঘটনাপ্রবাহের বিস্ড়রিত বিবরণ খলিফা স্যার কী চমৎকার ভাষায় অথচ নির্মোহভাবে দিয়েছেন তা আমাদের সংক্ষেপিত বর্ণনা হতেও বুঝা যাবে। ১৯২৭ সনের জুলাই মাসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া দশ বৎসরে চট্টগ্রাম, বর্ধমান, কুমিল□া, ময়মনসিংহ, বরিশাল, মুর্শিদাবাদ, এই ছয়টি জেলা ঘুরে খলিফা স্যার রাজশাহী সদরে একই সঙ্গে ট্রেজারী অফিসার ও এস.ডি.ও.র সেকেন্ড অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন। "দুইটি কাজই আমাকে সমানে একসঙ্গে করতে হত, সুতরাং প্রায় দিনই বাসায় ফিরতে ২/৩ ঘন্টা রাত হয়ে যেত। এস.ডি.ও. মহাশয় টি.এ. মারবার লোভে থাকতেন মফস্বলে পড়ে; drudgery-র জন্যই তো সেকেন্ড অফিসার; তাই দৈনন্দিন জেনারেল ফাইল এবং তার আরো অনেক কাজের চাপটা আমার উপরেই পড়ত, প্রায় চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়ারই যোগাড়। তার উপর এস.ডি.ও. ছিলেন বড্ড বেশী

চালাক; মফস্বলে যাওয়ার আগেই কেস রেডী না হতেই তিনি মামলাগুলি আমার ফাইলে ট্রান্সফার করে দিয়ে সরে পড়তেন। তবু রাজশাহীতে চলছিল বেশ। বিনা আপত্তিতে যখন খাটতে পারি; উপর থেকে যা পাঠায়, তাই যখন করি বিনা-ওজরে, বিনা-বাক্য ব্যয়ে, তখন ভাল চলবেই না কেন (পৃষ্ঠা ৫১/৫২/৫৩)?"

এই নির্বিরোধ, মুখ-বুজিয়া-খাটিয়া-যাওয়া, অতএব (খলিফা স্যারের নিজের ভাষায়) অকর্মা, মাথায় ছিট'ওয়ালা ব্যক্তিটির চরিত্র মূল্যায়ন করিতে তাঁহার উপরওয়ালারা যে ভুল করেছিলেন, তাহার মাশুল অবশ্য খলিফা স্যারকেই দিতে হয়েছিল। সেই কাহিনী বর্তমান প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

"ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রট আর ধূর্ত হিন্দু এস.ডি.ও. এবং পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেট এই তিন জনে মিলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গন্ডগোল জিউয়ে রাখার একটি সুন্দর সুযোগ পেয়েছিল রাজশাহীর রেশমপট্টির মসজিদকে উপলক্ষ্য করে। নকল রেশম আবিষ্কারের পর রেশম ব্যবসায়ে ভাটা পড়ে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বাসিন্দারা সুযোগ-সুবিধা মত অন্য রকম বৃত্তি গ্রহণ করে অনেকেই অন্যত্র চলে যায়, ফলে মসজিদটির উপযোগিতা যায় কমে। কিন্তু খোদার ঘর চিরকাল খোদারই থাকে। নাছোড়বান্দা অতি নামাজী দুই-চার জন লোক এবং পথচারী ব্যক্তিগণ সময়ে-অসময়ে সেখানে নামাজ আদায় করে; এখনও এবং প্রায় প্রত্যহই। ঐ মসজিদের পাশেই ছিল মস্ড় বড় একটা গভীর গর্ত। লক্ষপতি ব্যবসায়ী সেরাওগি মহাশয়ের রায়বাহাদুর হওয়ার স্বপ্ন; তাঁর দৃষ্টি পড়েছে ঐ গর্তটির উপর। একটি মাত্র অলকা সিনেমার উপর নির্ভর করে রাজশাহীর রস-পিপাসু জনসাধারণের তো আর সাধ মিটতে পারে না। পরে জেনেছি শাসনকর্তাদের ইঙ্গিতও ছিল যথেষ্ট; ঐ গর্তটি ভরাট করে সেখানে পূর্ণিমা সিনেমা হল তৈরী হবে; লাইসেন্স একরকম হয়েই আছে, Confidential file-এ সব deal করা হচ্ছে। যুক্তি দেওয়া হয়েছে প্রথমে প্রকাশ করা হবে, সেখানে একটি পাটের আড়ত আর গুদাম তৈরী হবে। কারণ মুসলমানেরা তো চিরকালই আনাড়ি; মসজিদের কাছে সিনেমা হল তৈরী হচ্ছে জানতে পারলে কোন এক পাড়া থেকে তারা একটুখানি উস্কানি পেয়ে হয়তো ভীষণ একটা গন্ডগোলই বাধিয়ে তুলতে পারে (পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬)।"

"গর্ত ভর্তি হয়ে গেল, দালান উঠছে, চেহারাটা ঠিক আড়ত বা গুদামের চেহারা তো নয়, সিনেমা হলের মত। একে-দুই, দুইয়ে-চার এই রকমভাবেই ফিস-ফিসানি আরম্ভ হল, আর দ্র ত বেগে বেড়ে চলল। সেরাওগি মহাশয়কে শেষ পর্যন্ড় স্বীকার করতে হল, আসছে অমক তারিখে পূর্ণিমা সিনেমা হলের উদ্বোধন হচ্ছে। মুসলমানেরাও চুপ করে নাই; শাসনযন্ত্রের উপরতলায় এখন নাকি তাদের নিজেদের লোক; ফজলুল হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী[৬], খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সভা-সমিতি শোভাযাত্রা সবই পুরাদমে চলতে লাগল। একদিনকার শোভাযাত্রাটা একটু বড় রকমেরই ছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট War I.C.S. Captain Johnston সাহেব গেল একটু ভড়কে। মুসলমানদের প্রতাপ একটু বেশী হয়ে পড়েছে। গন্ডগোলটা কি জানি কি বেশী দূরই

গড়ায়! সাবধানের বিনাশ নাই; সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এস.ডি.ও. এবং এস.পি. কে দিয়ে তিনি কয়েকজন মুসলমান প্রধানকে ডেকে আনলেন, বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কয়েকজন লোককে প্রতিনিধি মনোনীত করে একটি কমিটি গঠন কর, শাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আমি একজন মুসলমান কর্মচারী দিচ্ছি; সবাই মিলে কমিটিতে স্থির কর, কি তোমাদের অভিযোগ (grievance), আর কেমন করে কি হলে এ অভিযোগ দূর হবে।' কি আশ্চর্য্য, এতদূর পর্যন্ড় বিবরণ আমি নিজে কিছুই জানতাম না-আর কি অদ্ভূত লোক আমি, শোভাযাত্রার সংবাদটি পর্যন্ড় আমার কানে আসেনি। প্রথম খবর পেলাম এস.ডি.ও.র কাছে, তিনি যেদিন জানালেন যে, আমাকে কমিটির একজন সভ্য করা হয়েছে। তিনি উপদেশ দিলেন আমি যেন কনফিডেন্সিয়াল ফাইলটি দেখে নিই। ঐ ফাইলটির গুর"ত্ব আমি তখন অনুধাবন করতে পারি নাই; কাজেই ফাইলটি দেখতে ভুলেই গিয়েছিলাম। এখানে ঘটনার যেসব বিবরণ দেওয়া হল, সব বুঝলাম আস্ড়ে আস্ড়ে-যখন মহরমের দাঙ্গার মামলাটির শুনানি চলছিল এবং সওয়াল-জওয়াব হল (পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭)।"

"রাজশাহী সদরে সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে তখন ১০/১২ জন অফিসার; তার মধ্যে মুসলমান শুধু আমিই, সেই জন্যই আমাকে কমিটিতে রাখা হয়েছে। মুসলমান হয়ে আমি যেন মুসলমানদের স্বার্থের বির"দ্ধাচরণ করি; Confidential file দেখতে বলার উদ্দেশ্যও তাই। কমিটি গঠনের প্রস্ড়াব বেশ ভেবে চিন্ড়েই করা হয়েছিল, সাময়িকভাবে হলেও অন্ড়তঃ বেশ কিছুদিনের জন্য আন্দোলন বন্ধ থাকল। যা হোক কমিটি হল, কমিটিতে সিদ্ধান্ড়ও পাস হল। পরে বুঝলাম, কর্তাদের ইচ্ছা ছিল আমাকে দিয়ে বিপক্ষতা এবং দেরী করান। প্রকৃতপক্ষে আমি কমিটিতে সেরূপ কোনও অংশ (active part) নিই নাই; কেননা, আমার অফিসের কাজ দুইটি তো আর কমে নাই। রেশমপট্টির মসজিদে চিরকালই লোকে নামাজ পড়ে, মসজিদের পাশে সিনেমা চললে নামাজ পড়ায় বাধা সৃষ্টি হয়, সিনেমা হল বন্ধ না হলে মুসলমানেরা কিছুতেই নিরস্ড় হবে না, প্রয়োজন হলে তারা আরো বেশী জোর আন্দোলন শুর" করবে; অনেক কথার শেষে এই হল মোটামুটি কমিটির রায়। শেষে অনুরোধ করা হয়েছে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যেন দয়া-ধর্ম পূর্বক এসব কথা বিবেচনা করেন ও সিনেমা হলের লাইসেন্স খারিজ করে দেন (পৃষ্ঠা ৫৭)।"

"কিন্তু ব্যাপার হয়ে গেল উল্টা। কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর একদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর অফিস-কক্ষে আমাকে ডেকে নিলেন। রিপোর্টটি তিনি sentence by sentence, clause by clause, পড়লেন এবং প্রত্যেকটির পর তাঁর মন্ড়ব্য এবং এ বিষয়ে আমার আচরণ সম্বন্ধে সমালোচনা করতে লাগলেন। এক ঘন্টাব্যাপী সেই সুদীর্ঘ আলোচনার বর্ণনা দিয়ে কোনও লাভ নাই। তিনি রিপোর্ট থেকে পড়লেন, 'prayers are regularly held in the mosque'. আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'How do you know prayers are regularly held? Here is the report

of the divisional Commissioner (তিনি রিপোর্ট বার করে পড়লেন): 'It is an abandoned mosque; nobody performs his prayer there.' কাগজখানা উল্টিয়ে তিনি বার করলেন পূর্বেকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট, তারপর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডের রিপোর্ট-ঐ একই মর্মে। শেষে তিনি মন্ড়ব্য করলেন, 'These responsible officers did not find anybody performing any prayers there, and your eyes and ears were so keen that you could see them come and pray there?' আমি বিনীতভাবেই নিবেদন করলাম, 'এইসব অফিসাররা কোন দিনই সেই মসজিদে বসে লোকের নামাজ পড়া দেখার জন্য অপেক্ষা করেননি। ঘটনা এবং অবস্থাদৃষ্টি তাদের যা ধারণা, তাই তাঁরা লিখেছেন। আমিও কাউকে কিছু জানতে না দিয়েই হঠাৎ একদিন ঐ মসজিদে গিয়েছিলাম, মাগরিবের একটু আগে, দেখলাম পথচারী ৪/৫ জন লোক তাদের সঙ্গের জিনিসপত্রগুলি নামিয়ে ওজু করে, আশেপাশের আরো ৪/৫ জন বয়ঃবৃদ্ধ লোক এসেছিল, তাদের সঙ্গে একত্রে নামাজ আদায় করল। মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি পুরোনা ইঁদারা আছে, তার পানি বেশ সুন্দর, স্বচ্ছ। কোন সালে তৈরী, ইঁদারার গায়ে তা খোদাই করে লেখা আছে; পুরোনা ইঁদারা কিন্তু এর গায়ে বা আশেপাশে কোথাও শেওলা জমেনি; দেখে আমার মনে হল লোকে ইঁদারাটির যত্ন নেয়; আর তাই যদি হয়, সিদ্ধান্ড় করতে হবে লোকে এখানে নামাজও পড়ে। দুই-এক ওয়াক্ত হয়ত বাদও যেতে পারে, কিন্তু নামাজ লোকে এখানে প্রায় দিনই পড়ে। সাহেব, তুমি দয়া করে ওখানে গেলে, তুমিও ঐরূপ বলতে। সাহেব আরও রেগে উত্তর দিল: 'I am not such a fool' (পূর্ববর্তীদের কথা অবিশ্বাস করব এরূপ বোকা আমি নই)। অনেক কথাই হল, সব শেষে বললাম 'Sir, it is no use criticising and passing remarks on such delicate matters of personal opinion and findings, আমার ভুল হতে পারে; তোমারও হয়ত ভুল হতে পারত।' সাহেব তখন বলে উঠল, 'But your findings are unreasonable and communal; আমরা ভাবতেও পারিনি, তুমি এই রকম একখানা রিপোর্টে সই দিতে পার'। 'হতে পারে আমি একটু বোকা, কিন্তু আমি যা ভাল বুঝব, তাই ত করব; আমার বিশ্বাস, সাহেব তুমিও সেইভাবে কাজ করতে বলবে।' রিপোর্ট শেষ করে সাহেব নামল যুক্তিতে, 'সিনেমাতে সিনেমা হবে, মসজিদে লোকে পড়বে নামাজ; যে যার নিজের মনে নিজের কাজ করবে। এতে বাধাটা কোথায়? ইউরোপ-আমেরিকায় তো তাই-ই-হয়; প্রত্যেকে অপরের অধিকারকে সম্মান করে'। আমি বললাম, 'সাহেব, ইউরোপ-আমেরিকার কথা জানি না; তবে এখানকার ব্যাপারটা অন্যরূপ, ধর্মের নামে এদেশের লোক প্রাণও দেয়। গ"গোল করা ত তুচ্ছ ব্যাপার।' কথা কাটাকাটি করেই বিদায় নিলাম। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন, সিনেমা চলবে, মাগরিবের নামাজের জন্য আধাঘন্টা সিনেমা থাকবে বন্ধ। মুসলমানেরা পুনরায় আন্দোলন চালানোর কথা ভাবতে লাগল (পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯)।"

"রঙ্গমঞ্চে শীঘ্রই আবির্ভাব হল আর এক ফ্যাসাদের। মহরম আসছে এগিয়ে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী অনেক দল মিছিলের অনুমতি চেয়ে দরখাস্ড় করল। স্বার্থ-সংশি□ষ্ট আর

মজা-দেখার লোক সংসারে বহু, তারা নিশ্চিন্ড় নেই। মহরমের মিছিল[৭] কয়েকদিন চলে। চারিদিকে প্রচার হয়ে গেল, এবার মহরমের মধ্যে মুসলমানেরা দলে-দলে আক্রমণ করে পূর্ণিমা সিনেমা হল ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে। এই অজুহাতে সিনেমা হলের বারান্দায় আর ছাদে পুলিশের পাহারা বসল এবং সিনেমা কর্তৃপক্ষের লোক ঐ দুই জায়গাতেই প্রয়োজন হতে পারে বলে আগে থেকেই প্রচুর পরিমাণে ইট-পাটকেল মওজুদ করে রাখল। আর ঐ জন্যই জেলা কর্তৃপক্ষ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে, প্রত্যেক দলের জন্য পৃথক পৃথক পথ নির্দিষ্ট করে দিলেন, যাতে কোনও দুই দলের মধ্যে যেন কোনও সাধারণ রাস্ড়া না পড়ে এবং ঠোকাঠুকি না হয় (পৃষ্ঠা ৫৯)।"

"ঠিক কোতলের রাত্রি, দেড়টা কি দুইটা। মিছিল এগাচ্ছে, সিনেমার সামনের রাস্ড়া দিয়ে। মিছিলের লোকদের জব্দ করবার জন্যই এত বন্দোবস্ড়, ছাদ ভর্তি লোক আর পুলিশ। Superiority complex মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। নেহায়েৎ মজা দেখবার জন্য ছাদের উপর থেকে দুই-চার জন লোক দুই-চার খানা টুকরো ইঁট মিছিলের লোকের উপর দিল গড়িয়ে। একখানা একজনের গায়ের উপর পড়ল। মিছিলে লোকও কম যায় না; তারা সেই টুকরোগুলি ছুড়ে ফেলে দিল বারান্দায় যে পুলিশ পাহারায় ছিল তাদের উপর। পুলিশরাই বা ছাড়বে কেন? তারাও প্রত্যুত্তর দিল, বারান্দায় বোঝাই করে রাখা ইঁট-পাটকেল ছুড়ে। তারপর আরম্ভ হলো ইঁট-পাটকেল নিক্ষেপ আর প্রতি-নিক্ষেপ। ঘটনাক্রমে পরস্পর বিরুদ্ধে দুই দল আজ জুটে গিয়েছিল; কারবালা যুদ্ধের অনুকরণ তাই ইঁট-পাটকেল দিয়েই সুসম্পন্ন হল। রণক্লান্ড় মিছিলওয়ালারা অনেকে শেষে গেল পালিয়ে; তাদের একজন লোক জখমে প্রায় মরণাপন্ন হয়েছিল, তাকে নিয়ে তারা রাখল লুকিয়ে। সুবিধাজনক স্থানে থাকায় পুলিশের পক্ষে জখম বেশী হয়নি; দুই-একজন আহত কনষ্টেবল সকালে গেল হাসপাতালে তাদের সামান্য জখম পরীক্ষা করানোর জন্য, ২/৪ দিন কাজ থেকে অব্যাহতি মিলবে এই আশায়। তারপর দুইপক্ষই চুপচাপ, লড়াই-এর অবসাদ আর ক্লান্ড়ির পর নিস্ড়ব্ধতা। দুষ্ট-বুদ্ধি এগিয়ে এসে যুক্তি দিল, 'মুসলমানেরা কলকাতায় হক সাহেবের কাছে গিয়েছে, তোরা পুলিশ ব্যাটারা এখনও চুপচাপ আছিস। বাঁচতে চাস এখনও সময় আছে সার্টিফিকেট নিয়ে মোকদ্দমা দায়ের কর' (পৃষ্ঠা ৫৯)।"

"কিন্তু বিভ্রাট বাধল এখানেই। গভীর রাতে অন্ধকারের মধ্যে ঘটনা। কে চেনে দাঙ্গাকারীদের? ইঁট ছুড়েছে কে? কে জানে তাদের নাম? দুষ্ট-বুদ্ধি আবার সাহায্যে এগিয়ে এল, 'নাম না জানায় কি যায় আসে? লাইসেন্স দেয়া ১৫টি দলের দলপতির নাম তো কাগজেই লেখা আছে। আর রেশমপট্টি ও তার আশেপাশে যেসব মুসলমান বস্ড়ি আছে, সেখান থেকে জন দশেক জোয়ান জোয়ান লোক, যারা মহরমে যোগ দেয়, লাঠি খেলে, তাদের নাম সংগ্রহ করে নিয়ে এস'। ঠিক হল এই ২৫ জনের বিরুদ্ধে এজাহার দেওয়া হবে, অপরাধ; দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর মারপিট, ধারা ১৪৭ আর ৩২৩। মোকদ্দমা ভারী করতে হলে ভারওয়ালা একজন দামী লোকের এজাহার

প্রয়োজন। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা, একজন মুসলমান বাদী না হলে কি চলে? মুসলমানের ক্ষতি করতে হলে মুসলমান দিয়েই করতে হবে। শহরের ঘটনা, উপকণ্ঠেই পবা থানা সেখানেই একজন মুসলমান ও.সি. আছে, তাকেই ডেকে এনে এজাহার দেওয়া হল কোতোয়ালী থানায়, ঘটনার ৩১ ঘন্টা পর (পৃষ্ঠা ৫৯-৬০)।"

হ্যাঁ, দুটো কাজে সামান্য একটু অন্যায় হল। এই সামান্য অন্যায় যদি আমরা সামাল দিয়ে নিতে না পারি, তবে আমরা পুলিশ কিসের? তবে আমরা শাসন করব কেমন করে, আমরা দুর্বল হলে দেশের শাসনযন্ত্র বজায় থাকবে কেন? যারা ছিল না, ঘটনাটা করেনি, তাদের নাম দেওয়া এত কি অন্যায় হল? ঐ দলপতি ব্যাটারাই তো লাইসেন্স নিয়ে মহরমের ঘটনাটা ঘটিয়েছে। তারাই তো আদি। তারা ঘটনাস্থলে থাকলে তারাই তো মারপিট করত, ছেড়ে কথা বলত নাকি? তাদের নাম দেওয়া খুবই ঠিক হয়েছে। আর মুসলমান দারোগাকে বাদী করা ভালই হল। ঘটনা সে দেখেনি, কি যায় আসে? ঘটনার কথা শুনেছে তো? মুসলমান আগে না চাকুরী আগে? পুশিশের চাকুরী, তার উপর বড় দারোগা, অনেক জন্মের তপস্যার ফল (পৃষ্ঠা ৬০)।"

"সব জিনিসেই সাজগোজ প্রয়োজন, মোকদ্দমাতেও। কিন্তু কতটা যে বাড়াবাড়ি করা হল, সে কথা তখন কারও মাথায় এল না। এসব প্রকাশ পেল, মোকদ্দমা শুনানির সময়, সওয়াল-জবাবে। সাজানো মোকদ্দমার সব কয়টা বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবেই বজায় রাখা হয়েছিল এই মোকদ্দমায়। পুলিশের মোকদ্দমা, সুতরাং চার্জশিটও একটু তাড়াতাড়িই হল। কেননা সব তো আগে থেকেই investigation-এ স্থির হয়ে আছে; সাধারণ মোকদ্দমার inverse proportion. পরের পর্য্যায় কোর্ট; এস.ডি.ও. আর পুলিশ সাহেব Johnston সাহেবকে বুঝালেন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা, মুসলমান হাকিম হলেই ভাল হবে। খলিফা সাহেবই রাজশাহীতে একমাত্র মুসলমান হাকিম; সুতরাং মোকদ্দমাটি সেজেগুজে, প্রায় international মর্যাদা নিয়ে এই হতভাগ্যের ঘাড়েই ভর করল। এত কথা লিখলাম বটে, কিন্তু এ সব জানলাম অনেক পরে, এমন কি রায়েরও অনেক পরে। আসল কথা, আমি আদার ব্যাপারী, আমার জাহাজের খবর নেওয়ার, রাখবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। মহরমের দাঙ্গার কেস, সিনেমা হলের সঙ্গে এর সম্বন্ধ বুঝতে পারলাম প্রথম যে দিন সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হল (পৃষ্ঠা ৬০-৬১)।"

"মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হয়ে গেছে, চলছে-একদিন S.D.O. সাহেব আমাকে তাঁর নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে বেশ আদরের সঙ্গেই মুরুব্বিয়ানা সুরে বললেন; 'দেখুন খলিফা সাহেব এই সব মুসলমান গুন্ডা, দাঙ্গা বাধায় হাঙ্গামা করে, মহরমে লাঠি খেলে, পুলিশকে মারধোর করে। এদের প্রশ্রয় দিলে শাসনযন্ত্র (administration) বিকল হয়ে পড়বে; আমরা ম্যাজিস্ট্রেটরা আছি এদের বাধা দেওয়ার জন্য, অন্যায়কারীকে সায়েস্ড়া করার জন্য, শাসন ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য। আপনার কাছে মহরমের মোকদ্দমা চলছে, গুন্ডা বদমাইসদের কেস, আশা করি, আপনি মোকদ্দমাটার সুবিচার করবেন। ডিস্ট্রিক্ট

ম্যাজিস্ট্রেট সে বার আপনার উপর একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, এ কেসে সুবিচার হলে তিনি আপনার বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করবেন' ইত্যাদি, ইত্যাদি। বুঝলাম, ঝঞ্ঝাট আবার ঘাড়ে চেপেছে। S.D.O. কে জবাব দিয়ে এলাম, 'আমি case-এ সুবিচার করব না, এ ধারণা আপনার কেমন করে হল? (পৃষ্ঠা ৬১)'।

"মোকদ্দমা চললও বেশ অনেকদিন, সাক্ষী হল অসংখ্য। শেষে সওয়াল-জবাব, দুই দিন পরে ফের শুনানি। কোর্ট ইন্সপেক্টারের সবার সেরা এক কথা, 'অতগুলি পুলিশ কর্মচারী কি এক যোগে মিথ্যা কথা বলতে পারে?' পরিশেষে রায়। রায় লম্বাই হল; সারা রবিবার দিনরাত খেটে খুটে টাইপ করা ১২ পৃষ্ঠা। এখন রায় থেকেই শুনুন গোটা কতক কথা। বাংলা করেই বলছি: '১৫ টি দলকে মিছিলের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, কর্তৃপক্ষ এবার বিশেষ সাবধান হয়ে প্রত্যেক দলের জন্য নির্দিষ্ট পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, দুই দলের কোনও সাধারণ পথ ছিলনা; প্রত্যেক দলের সঙ্গে থাকবে দুইজন করে কনস্টেবল, একজন চলবে দলের পুরোভাগে দলপতির সঙ্গে; আর একজন থাকবে দলের পিছনে সহ-দলপতির সাথে, দলের কোনও লোক যেন পরে অন্য রাস্ড়া দিয়ে না যায়। কনস্টেবলদের উপর কড়া নির্দেশ জারী করা হয়েছে মিছিলের সঙ্গে দলপতি থাকবে, অন্য আর কোনও পথ দিয়ে মিছিলকে কোনওক্রমেই যেতে দেওয়া হবে না। সুতরাং অন্য পথে নামা মাত্র দলপতির ঘাড়টি ধরে কনস্টেবল তাকে ঠিক পথটিতে নিয়ে আসবে। এরূপ দলপতিরা যখন সিনেমা হলে যাওয়ার জন্য নিজের পথ ছেড়ে অন্য পথে নেমেছিল, সঙ্গের কনস্টেবলরা তখন কি করছিল? তারা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছিল? পবা থানার বড় দারোগা স্বীকার করেছেন তিনি ঘটনা দেখেননি, ঘটনাস্থলে পর্যন্ড় যাননি। প্রশ্ন হল, ইঁটগুলি এল কোথা থেকে? রাস্ড়ার দু'পাশে নিশ্চয়ই ইঁট ছিল না; মিছিলওয়ালারা কি তবে ইঁট ঘাড়ে করে বাড়ী থেকে বার হয়েছিল? না পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিল? সঙ্গের কনস্টেবলরা কি করছিল? তদন্ড় কারী দারোগা সাহেব বলেছেন তিনিও ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন ঘটনার ২ দিন পরে; ইঁট-পাটকেল তিনি রাস্ড়ার পাশ থেকে দু'-একখানা নিয়েছেন, সিনেমা হলের বারান্দায় ইঁট দেখেননি। ছাদে ইট আছে কিনা তিনি খোঁজ নেননি। সমস্ড় অবস্থা বিবেচনা করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাচ্ছে বাদীপক্ষের মোকদ্দমা শুধু যে মিথ্যা তাহাই নহে, ইহা সম্পূর্ণ সাজানো। আসামীদিগকে বে-কসুর খালাস দেওয়া হল। সিদ্ধান্ড়গুলি মোটামুটি বলে ফেল-াম, রায়ে এগুলির সমর্থনে ছিল আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতা অনুযায়ী চুলচেরা আলোচনা। অনিচ্ছুক সাক্ষীদের মিথ্যা বা অসত্য ভাষণের স্ড়প থেকে, অসতর্ক মুহূর্তে ইতস্ড়তঃ বিক্ষিপ্ত সত্যের যে দু'চার কণা এখানে-ওখানে বের হয়ে আসে, পরস্পর সওয়াল-জবাবের সহায়তায় ঘটনা প্রবাহ (circumstances)-এর কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে, বহু চিন্ড়া-ভাবনা-পরিশ্রমের পর, অনেক কিছু লিখিত আলোচনা-সমালোচনার শেষে সিদ্ধান্ড়ে পৌঁছাতে হয়। সুতরাং রায় বেশ দীর্ঘই হয়েছিল এবং আলোচনা করতে হয়েছিল অনেক জিনিস, বহু দৃষ্টিকোণ থেকে (পৃষ্ঠা ৬১-৬৩)।"

"জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস.পি. এবং এস.ডি.ও. নজর রাখছেন, এই রকম পুলিশের তোড়জোড় করা একটা মামলার এই রকম অনাকাঙ্খিত পরিণতি, তারা কেউ আশা করেন নাই, সুতরাং সকলেই আমার উপর চটলেন। সবচেয়ে চটে গেলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনস্টন সাহেব। আমার বির"দ্ধে confidential report গেল খলিফা সাহেব শুধু অপদার্থই নয়, communal-ও। তারপর ৪/৫ মাস গেল। মনে করলাম এতদিনে নিশ্চয়ই সাহেবের রাগ কমে গিয়েছে। সাহেবকে এবার একবার ভজাবার চেষ্টা করি; ভাল একখানা confidential যাতে পাঠায়। এক সকালে গেলাম নদীর ধারে তার বাংলোয়। আরদালী কার্ডদিতেই আমার ডাক পড়ল। নমস্কারের পর প্রতি-নমস্কার নয়, বিনয়-বচনের কোনও প্রয়োজন নাই। একেবারেই গর্জে উঠল, 'সাহস করে তুমি ঐ মহরমের দাঙ্গার শয়তান আসামীগুলোকে স্রেফ খালাস দিলে, জান এর দ্বারা পুলিশকে এবং শাসন-বিভাগকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে'? আমি বল-াম, 'সাহেব, যখন আমরা বিচার করি, তখন বিচারই করি; কে বাদী কে বিবাদী দেখি না, মোকদ্দমা সত্য বুঝলে আসামীকে শাস্ড়ি দিই-মিথ্যা ধরতে পারলে আসামী খালাস পায়। তুমি যদি এই মোকদ্দমার সাক্ষী প্রমাণ শুনতে, তুমিও মোকদ্দমাটি সাজানো এবং মিথ্যাই মনে করতে, আসামীদের খালাস দিতে'। সাহেব গেল আরও চটে, বলে ফেল: 'মুসলমানেরা তোমার কাছে এসেছিল (approached you); ও রায় তোমার নিজের লেখা নয়'। আমি উত্তর দিলাম, 'সাহেব, আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা এত খারাপ যে, তুমি মনে কর ১০/১২ বছর বিচারকের কাজ করে একটুকরা রায়ও আমি লিখতে শিখিনি'। সাহেব শেষ কথা বলে দিল, 'I have written against you to the Government; the case is coming for re-trial; you have to come to me for your help, for your service.' কি করতে গেলাম, কি হল। কিছু না ভেবে আমি বলে ফেললাম, 'If that contingency ever arises, I shall never come before Captain Johnston; 'Well, no more about this nasty afair' বলেই সাহেব ইতি টেনে দিল। ছেড়ে দেওয়া আসামীকে ফের জড়াবার জন্য অনেক কিছু করতে হয়; ব্যাপারটি মোটেই সহজ নয়। কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট; এস.পি. এবং এস.ডি.ও. যখন স্বার্থ-সংশি□ষ্ট, আর শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে যাবে যখন অভিযোগ, a grave and serious miscarriage of justice প্রমাণ হতে দেরী হবে না: মোকদ্দমা নির্ঘাত ফিরবে। Third Officer N. Maitra-র নিকট মোকদ্দমাটি গেলে, তিনি তো শাস্ড়ি দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েই আছেন। চাকুরিতে উন্নতির জন্য যে কোনও কাজ করতে তারা আগ্রহী বিশেষতঃ আসামী যখন মুসলমান এবং ছোটলোক। মধ্য থেকে প্রমাণ হয়ে যাবে Mr. Khalifa সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন (communal)। মুসলমান হয়ে মুসলমান আসামীর উপর সুবিচার করার অধিকারটুকুও আমার নাই (পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪)।"

Communal অপবাদ এড়াইতে খলিফা স্যার কলিকাতায় তদবিরে গেলেন[৮]। "খবর নিতে নিতে জানা গেল ফাইল আছে Deputy Legal Remembrancer-এর কাছে। তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়ে যখন বুঝলেন, এ মোকদ্দমায় সুবিচার হলে আসামীরা

খালাস পেতে বাধ্য, তখন তিনি ঠিকমতই রিপোর্ট দিলেন। মোকদ্দমা আর পুনর্বিচারে এল না। বাঁচা গেল; নটে গাছটি মুড়ালো।"

শেষ বয়সে খলিফা স্যার বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষরতা দানের জন্য একটি সহজ ও কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবনে ও উহার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন। আজীবন জ্ঞানপিপাসু এই মহৎ ব্যক্তির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 'খোদার ঘর চিরকাল খোদারই থাকে' এই বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া যে বান্দা উপরওয়ালার শত চাপ সত্ত্বেও নিজের বক্তব্য হইতে বিচ্যুত হন নাই, তাঁহার আত্মা পরম কর"ণাময়ের অশেষ কর"ণাধারায় সিক্ত থাকিবে, এই বিশ্বাস আমরা নিশ্চয়ই পোষণ করিতে পারি।

তথ্যসূত্র

১. স্যার তাঁহার নাম এইভাবে লিখিতেন। ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটে নাম Aziz Rahman Khalifa দেখা যায়।

২. ফজলুর রহমান সাহেবের ভাষ্যমতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাঁহাকে বিপদসঙ্কুল চট্টগ্রামে বদলী করায় তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

৩. খলিফা সারের ভাষ্যমতে তিনি রেক্টর হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।

৪. তথাকথিত এই জিদের বহিঃপ্রকাশ 'রাজশাহীতে মহরমের দাঙ্গা' প্রসঙ্গে জোরালোভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৫. বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তবর্তী মাথাভাঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে (বর্তমানে পশ্চিম বাংলায়) অবস্থিত।

৬. তৎকালীন বৃটিশ শাসিত বাংলাদেশের Chief Minister কে বাংলায় প্রধানমন্ত্রী বলা হইত।

৭. মহরমের পটভূমি ও উৎসব সম্পর্কে খলিফা স্যারের বর্ণনা (ঈষৎ সংক্ষেপিত): "মহরমে তো দাঙ্গা লেগেই থাকে। আসলটাই ছিল একটা মস্ত বড় দাঙ্গা, কারবালার ময়দানে, বাধিয়েছিল এজিদ; শহীদ হয়েছিল বড় বড় বিখ্যাত বিখ্যাত লোক। তাই উপলক্ষ্য করেই এই নকল উৎসব, এত সমারোহ। ফোরাত নদীর ধারে কারবালা ময়দান তো আর মিলান যাচ্ছে না, আমাদেরই বাড়ীর আশেপাশে গলিতে-গলিতে চলুক না তার মহড়া। তবে রাজশাহীর মহরমের মিছিলে কিছু নূতনত্ব এবং বৈচিত্র্যও আছে। প্রতিবেশী হিন্দু ভাইদের 'বার মাসে তের পার্বণ'; নাচে-গানে-বাজনায় বাড়ী-ঘর তারা করে তোলে আনন্দমুখর, প্রাণবন্ত। আশেপাশের মুসলমান বাড়ীর বাসিন্দাদেরও তাই দেখে মনে কি কোন সাধই জাগে না? একটি বারের জন্যও কি আনন্দঘন-উৎসবের একটু ক্ষীণ আশা তাদের মনের মধ্যে উঁকি মারে না? পৃথিবীর সবটাই হতে হবে তাদের কাছে গদ্য! মহরমই একমাত্র উৎসব যাতে আমাদের অশিক্ষিত ভাইদের সেই মনের-গহন- থেকে-উঁকি-মারা সাধটির কিছুমাত্র পূরণ হয়। মহরম পর্ব উপলক্ষ্যে উঁচু উঁচু রং-বেরং-এর তাজিয়া গড়ে তার তাদের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সাধ মেটায়। তাজিয়া ঘাড়ে উঁচু উঁচু ঝান্ডা হাতে একদল লোক

চলে, মুখে হায় হাসান, হায় হোসেন ধ্বনি; একদল কাড়া-নাকাড়া, ঢোল-খঞ্জর বাজায়; লাঠি হাতে একদল নেচে-কুঁদে পাঁয়তারা ভেঁজে কারবালা যুদ্ধের অনুকরণ করে; লাঠির মাথায় ময়না, ছেঁড়া নেকড়া জড়িয়ে তাতে কেরোসিন মাখায়, আর তাই জ্বালিয়ে রাত্রির অন্ধকারকে আলোকিত করে চলে তাদের মিছিল, ধীরে-ধীরে, আস্তে-আস্তে। গরীব তারা, দিনে বেরোতে পারে না, আর দিনের বেলায় রাস্তায় যানবাহনের অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। আগে এরা লাঠি খেলতো, বাস্তবিকই তা ছিল দেখার মত জিনিস; প্রতিপক্ষের সত্যি আঘাত সামলানো কম শিক্ষা, ক্ষিপ্রতা এবং নৈপুণ্যের কথা নয়। কিন্তু সেসব দিন চলে গেছ। এখন যা হয় তা সত্য সত্যই নকল লাঠি খেলা। মহরমের মিছিলে যারা সক্রিয় অংশ নিয়ে মাতামাতি করে এই কয়দিন তাদের কি অমানুষিক পরিশ্রমটাই না স্বীকার করতে হয়! যারা বুক চাপড়ায় তাদের অবস্থা তো আরো কাহিল। পরিশ্রমের সঙ্গে পাল□া দিয়ে চলতে হলে শরীরটাকে আর মনটাকে চাঙ্গা রাখার জন্য একটু নেশা-ভাঙ্গের প্রয়োজন হয় বৈ কি! তাড়ি খেয়ে এসে মিছিলে যোগ দিয়ে সাধারণ মুসলমান ভাইয়েরা মহরমের এই কয়দিন বেশ আনন্দেই কাটায়। শিক্ষিত মুসলমান এসব মানতে চায় না; তাজিয়াকে তারা প্রতিমা পূজার মতই শরিয়ত-বিরোধী কাজ মনে করে; ধর্মের নামে রাস্তায় রাস্তায় নেচে-কুঁদে লাফা-লাফি করাটাকে তারা অধর্মের শামিলই মনে করে; তাড়ি খাওয়াকে ঘৃণা করে। কিন্তু দীর্ঘ একটি বছর সময়ের পর এই উৎসব, এই বাজনা, এই মিছিল তাদের একঘেয়ে জীবনে একটু পরিবর্তনের সাধ ও আনন্দ আনে বৈ কি! শিক্ষিতেরাও এই মিছিলের অধর্মকে সহ্য করেই চলে; সুতরাং মহরম চলে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চিৎকার, গন্ডগোল, মারামরি, বুকে করে নিয়েই মহরম চলে (পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫)।"

৮. "কলকাতায় গিয়ে এক সন্ধ্যার পরে উঠলাম হক সাহেবের ঝাউতলার বাড়ীতে। লোকে লোকারণ্য, অল্প পরিমাণ জায়গা গম্‌গম্‌ করছে; রাত দশটায় ডাক পড়ল। হক সাহেব তখন ঝিমুচ্ছেন, বেচারী খুবই ক্লান্ত, লোকে তাঁকে এত উৎপাত করে। হক সাহেব এক রকম না শুনেই মধ্যে মধ্যে জানান, সব জানি। না শুনে যে লোক বলেন 'সব জানি' তাকে বলে লাভ কি? খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের কাছে যাওয়া হল পরের দিন। আমাকে তিনি বেশ সুন্দর সুন্দর উপদেশই দিলেন, 'দেখুন খলিফা সাহেব, জলে বাস করে কুমীরের সাথে বিবাদ করা চলে না। চাকুরী যখন করতে এসেছেন, তখন উপরওয়ালাদের মর্জি-মাফিক চলতে তো হবেই' (পৃষ্ঠা ৬৪)।"

W